**স্বাধীনতা পুরস্কার ২০১৫ প্রদান অনুষ্ঠান**

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

**শেখ হাসিনা**

ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তন, ঢাকা, বুধবার, ১১ চৈত্র ১৪২১, ২৫ মার্চ ২০১৫

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

অনুষ্ঠানের সভাপতি,

স্বাধীনতা পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ,

সহকর্মীবৃন্দ ও উপস্থিত সুধিমণ্ডলী।

আসসালামু আলাইকুম।

স্বাধীনতা পুরস্কার ২০১৫ উপলক্ষে আয়োজিত আজকের অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। স্মরণ করছি চার জাতীয় নেতা-সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আহমেদ, এম মনসুর আলী এবং এএইচএম কামারুজ্জামানকে। স্মরণ করছি মুক্তিযুদ্ধের সকল শহীদদের। সম্ভ্রমহারা মা-বোনদের, আমাদের বীর মুক্তিযোদ্ধাদের।

আমি গভীর কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি বিশ্বের বিভিন্ন মিত্রদেশের সরকার ও জনগণকে, যাঁরা মুক্তি-সংগ্রামে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন।

গভীর বেদনার সাথে স্মরণ করছি পঁচাত্তরের ১৫ই আগস্ট জাতির পিতার সঙ্গে শাহাদতবরণকারী আমার স্নেহময়ী মা ফজিলাতুন্নেছা মুজিব, আমার তিন ভাই শেখ কামাল, শেখ জামাল ও শেখ রাসেলসহ সেই রাতের সকল শহীদকে।

‘স্বাধীনতা পুরস্কার’ দেশের সর্বোচ্চ জাতীয় পুরস্কার। বিগত বছরগুলোর ধারাবাহিকতায় আমরা এ বছর সাতজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে স্বাধীনতা পুরস্কারে ভূষিত করা হচ্ছে।

যে সকল বরেণ্য ব্যক্তি ২০১৫ সালের স্বাধীনতা পুরস্কার লাভ করেছেন, তাঁদেরকে আমি অভিনন্দন জানাই। যাঁরা মরণোত্তর পুরস্কার পেয়েছেন, তাঁদের স্মৃতির প্রতি জানাই শ্রদ্ধা।

সুধি,

জাতির পিতার নেতৃত্বে দীর্ঘ ২৩ বছরের নিরন্তর সংগ্রাম এবং অপরিসীম আত্মত্যাগের পর ১৯৭০-এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। কিন্তু পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠি ক্ষমতা হস্তান্তর না করে টালবাহনা শুরু করে। বঙ্গবন্ধু অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। এর ধারাবাহিকতায় জাতির পিতা ৭ই মার্চ তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে স্বাধীনতার ডাক দেন। তিনি বলেন, ‘‘এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম। এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম’’।

পাকিস্তানী হানাদাররা ২৫শে মার্চের কালরাতে নিরস্ত্র বাঙালির উপর গণহত্যা শুরু করে। বঙ্গবন্ধু গ্রেফতারের পূর্ব মূহুর্তে ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। তাঁর এই ঘোষণা টেলিগ্রাম, টেলিপ্রিন্টার ও তৎকালীন ইপিআর-এর ওয়ারলেসের মাধ্যমে সমগ্র বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়ে।

প্রতিটি জেলা ও মহকুমায় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে এই ঘোষণা ব্যাপকভাবে প্রচার করা হয়। সাথে সাথে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমেও এই ঘোষণা প্রচারিত হয়।

৯-মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর ১৬ই ডিসেম্বর বাঙালি জাতি চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করে। ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু দেশে ফিরে আসেন। তিনি যখন স্বাধীন বাংলাদেশের পুনর্গঠন কাজে আত্মনিয়োগ করেন, তখনই ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট স্বাধীনতার পরাজিত শক্তি তাঁকে সপরিবারে হত্যা করে।

এই হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রা ও উন্নয়নকে স্বব্ধ করে দেওয়া হয়।

অবৈধভাবে ক্ষমতা দখলকারী সামরিক শাসক জিয়া স্বাধীনতাবিরোধী ও যুদ্ধাপরাধীদের রাজনীতিতে পুনর্বাসন করে। জনগণ বঞ্চিত হয় ভাত ও ভোটের অধিকার থেকে। সংবিধান ও আইনের শাসন হয় দলিত। অবাধে চলে সংবিধান লঙ্ঘন, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃতি আর মিথ্যাচার। ইতিহাস থেকে মুছে ফেলার চেষ্টা করা হয় বঙ্গবন্ধুর নাম।

এসব অপচেষ্টার পরও বঙ্গবন্ধু প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন প্রতিটি বাঙালি মনের মণিকোঠায়। বিশ্বের নির্যাতিত-নিপীড়িত মানুষের অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা আজও বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত ও প্রশংসিত।

সম্মানিত সুধিমণ্ডলী,

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু আইন করে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারকাজ শুরু করেছিলেন। অনেকের নাগরিকত্ব বাতিল হয়েছিল। হত্যা-অগ্নিসংযোগ ও ধর্ষণের মতো মানবতাবিরোধী অপরাধের সাথে জড়িতদের গ্রেফতার করা হয়েছিল। কিন্তু তাঁকে হত্যা করে সে উদ্যোগ বানচাল করা হয়।

জিয়া ক্ষমতায় এসে ১১ হাজার সাজাপ্রাপ্ত যুদ্ধাপরাধীকে জেল থেকে ছেড়ে দেয়। শাহ আজিজকে প্রধানমন্ত্রী করে। রাজাকার মান্নান ও আলীমদের মন্ত্রী বানায়। অন্যদিকে খালেদ মোশাররফ ও তাহেরসহ মুক্তিযোদ্ধাদের হত্যা করে।

তাঁর স্ত্রী খালেদা জিয়াও একই পথ অনুসরণ করে নিজামী-মুজাহিদদের গাড়ীতে তুলে দেয় লক্ষ শহীদের রক্তে রঞ্জিত জাতীয় পতাকা।

২০০৮ এর নির্বাচনে জাতির কাছে আমরা অঙ্গীকার করেছিলাম, সরকার গঠন করলে ১৯৭১ সালে সংগঠিত গণহত্যা, মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ ও যুদ্ধাপরাধের বিচার করবো।

এ জন্য আমরা The International Crimes (Tribunals) Act, 1973 এর আওতায় দু’টি আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল গঠন করি। যুদ্ধাপরাধ ও মানবতাবিরোধী অপরাধে অভিযুক্তদের বিচারের ক্ষেত্রে ট্রাইব্যুনাল সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

ইতোমধ্যে ট্রাইব্যুনাল ১৮টি মামলার রায় প্রদান করেছে। উচ্চ আদালতে আপিলসহ সকল আইনি প্রক্রিয়া অনুসরণ করে একটি মামলার সর্বোচ্চ শাস্তি অর্থাৎ মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছে। অপর মামলাগুলিতেও যথার্থ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে বিচারের প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে।

২০০৯ সালে আমরা দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই বিএনপি-জামাত যুদ্ধাপরাধীদের রক্ষায় মরিয়া হয়ে উঠে।

জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের পথেও তারা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে এবং দেশব্যাপী নৈরাজ্য, সন্ত্রাস ও নাশকতায় লিপ্ত হয়।

৫ জানুয়ারি নির্বাচনের আগে তারা পেট্রোল বোমা, ককটেল হামলায় শতাধিক মানুষ হত্যা করে। হাজার হাজার গাড়িতে আগুন দেয়, ভাংচুর করে। রেললাইন উপড়ে ফেলে, ফিশপ্লেট খুলে নেয়।

মসজিদ-মন্দিরে হামলা করে। বায়তুল মোকাররমের সামনে হাজার হাজার কোরান শরীফ আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয়।

নির্বাচনের দিন ৫৮২টি স্কুলে আগুন দেয়। প্রিসাইডিং অফিসারসহ ২৬ জনকে হত্যা করে। নির্বাচনের পর সংখ্যালঘু এবং আওয়ামী লীগ সমর্থকদের বাড়িঘরে হামলা চালায়, আগুন দেয়।

দেশ যখন এগিয়ে যাচ্ছে ঠিক তখনই বিএনপি-জামাত জোট পিছনের দরজা দিয়ে ক্ষমতায় যাওয়ার লোভে ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত হয়েছে। গত ৬ জানুয়ারি থেকে গত আড়াই মাসের বেশি সময় ধরে তারা হরতাল অবরোধের নামে মানুষ হত্যা করছে।

প্রায় ১৫ লাখ এসএসসি পরীক্ষার্থীসহ ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা জীবন পরিকল্পিতভাবে ধ্বংস করার অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

বিএনপি-জামাতের সন্ত্রাসীদের পেট্রোলবোমা কেড়ে নিয়েছে মুক্তিযোদ্ধা, গরীব ট্রাক ড্রাইভার, স্কুলছাত্রসহ নিরীহ মানুষের জীবন।

জনগণের জানমালের নিরাপত্তা বিধান সরকারের দায়িত্ব। সেই দায়িত্ব পালনে আমাদের সরকার কোন ধরণের ছাড় দেবেনা। নাশকতার সাথে জড়িত, অর্থের যোগানদাতা ও নির্দেশদাতা সবাইকেই ধরা হবে।

সম্মানিত সুধিমণ্ডলী,

গত নির্বাচনে জনগণ মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনার আলোকে ক্ষুধা, দারিদ্র্য, বৈষম্য, সন্ত্রাস ও সাম্প্রদায়িকতামুক্ত ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার ম্যান্ডেট দিয়েছে।

বিশ্বমন্দা সত্ত্বেও বাংলাদেশের অর্থনীতির অব্যাহত প্রবৃদ্ধি ও সামষ্টিক অর্থনীতির স্থিতিশীলতা অক্ষুণ্ণ রয়েছে। বিগত ৬ বছর ধরে ৬.২ শতাংশ হারে প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। মাথাপিছু আয় বেড়ে ১ হাজার ১৯০ মার্কিন ডলার হয়েছে। মুল্যস্ফীতির হার ৬ শতাংশে নেমে এসেছে।

২০১৫ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ২৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ছাড়িয়ে গেছে। দারিদ্রের হার ২০০৯ সালের শতকরা ৩৩ দশমিক ৪ ভাগ থেকে হ্রাস পেয়ে ২০১৪ সালে শতকরা ২৪ দশমিক ৭ ভাগ হয়েছে।

২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ একটি মধ্য-আয়ের দেশে পরিণত করার লক্ষ্য আমরা কাজ করছি। এজন্য আমরা ২০১০-২১ মেয়াদের প্রেক্ষিতে পরিকল্পনা এবং ২০১১-১৫ মেয়াদের ‘ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা’ সফলভাবে বাস্তবায়ন করছি। সরকারের অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে ২০২১ সাল নাগাদ জাতীয় প্রবৃদ্ধি ১০ শতাংশে উন্নীত করা।

বাংলাদেশ এখন সারাবিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেল। পদ্মা সেতু নির্মাণ কাজ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে শুরু হয়েছে। ২০১৮ সাল নাগাদ যান চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া সম্ভব হবে।

এছাড়া, মহাকাশে বাংলাদেশের প্রথম স্যাটেলাইট ‘বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট’ উৎক্ষেপণ, পায়রা সমুদ্রবন্দর নির্মাণ, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন, ঢাকায় মেট্রোরেল স্থাপন, রামপাল ও মহেশখালীর মাতারবাড়িতে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্র, জ্বালানি ও যোগাযোগ অবকাঠামো উন্নয়নে গৃহীত মেগা প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়িত হচ্ছে।

আমরা খাদ্যশস্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছি। দেশের ১৬ কোটি মানুষের খাদ্যের চাহিদা মিটিয়ে বাংলাদেশ বর্তমানে বিদেশে খাদ্য রপ্তানি করছে।

‘ডিজিটাল বাংলাদেশ’ বিনির্মাণে বাংলাদেশ দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনের ওয়ার্ড এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে ৫ হাজার ২৭৫টি ডিজিটাল সেন্টার চালু করা হয়েছে।

শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ ও নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ উন্নয়নের মহাসড়কে এগিয়ে যাচ্ছে। ইনশাআল্লাহ ২০৪১ সালের মধ্যে আমরা উন্নত দেশের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হতে পারব।

সম্মানিত সুধিমণ্ডলী,

মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বিকাশ এবং মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে সরকার বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে আসছে।

আমরা অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা ভাতাভোগীর সংখ্যা ও ভাতার পরিমাণ বৃদ্ধি করেছি। মুক্তিযোদ্ধাদের মাসিক ভাতা ৯০০ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ৫০০০ টাকা করা হয়েছে।

বিভিন্ন জেলা ও উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপেক্স নির্মাণ ও অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য আবাসন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য ঢাকার মোহাম্মদপুরে আবাসিক ও বানিজ্যিক ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। তাঁদের উন্নত চিকিৎসাসেবা প্রদানের লক্ষে একটি আধুনিক হাসপাতাল নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। মুক্তিযোদ্ধা সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অবসর গ্রহণের বয়সসীমা ৫৯ বছর থেকে বৃদ্ধি করে ৬০ বছর করা হয়েছে।

স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ এবং জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনন্যসাধারণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০০৯ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত ৮৪ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি ও চারটি খ্যাতনামা প্রতিষ্ঠানকে স্বাধীনতা পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছে।

এ ছাড়া বিগত বছরগুলোতে আমরা ৩২৫ জন বিদেশি বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ী ও ১১টি প্রতিষ্ঠানকে সম্মাননা প্রদান করেছি।

স্বাধীনতা পুরস্কারপ্রাপ্ত সম্মানিত সুধিবৃন্দ,

স্বাধীনতার অবিনাশী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে গৌরবোজ্জ্বল ও কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ আপনারা আজ সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় পুরস্কারে ভূষিত হলেন। আপনাদের সবাইকে আবারও জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।

আপনারা দেশ ও জনগণের কল্যাণে নিজেদের আরও গভীরভাবে নিয়োজিত করবেন - এ প্রত্যাশা সবার।

উপস্থিত সবাইকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

...